Bangladesh Journal of Integrated Thoughts, 2025
DOI: https://doi.org/10.52805/bjit.v21i1.332

বই রিভিউ

এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্স, কুরআনী জ্ঞানতত্ত্ব ও মুঈনুদ্দীন আহমদ খানের গবেষণা

মুসা আল হাফিজ[১]

সক্রেটিস থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল অবধি মহান চিন্তকদের অন্তরাত্মা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তাদের প্রত্যেকেই প্রাচ্যের প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়েছেন দক্ষতার সাথে। কিন্তু পশ্চিমা চিন্তকদের একটি সাধারণ প্রবণতা হলো ওরিয়েন্টাল উইজডম থেকে ঋন নেবার প্রশ্নে যতোটা সচেষ্ট, সেই ঋণ স্বীকার না করার প্রশ্নে ততোটাই যত্নবান। প্রকাশ্যে যেমন তারা একে স্বীকার করেন না, তেমনি অপ্রকাশ্যেও। আভাসে - ইঙ্গিতেও তারা এই স্বীকারোক্তিকে এড়িয়ে যান।

পশ্চিমা মনীষীদের এই প্রবণতা নিয়ে প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ বইয়ে আলোকপাত করেছিলাম। যদিও ভুলে যাইনি, পশ্চিমা চিন্তকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ এমন, যারা পশ্চিমা চিন্তায় প্রাচ্যের লিগ্যাসিকে অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু সেই অনুসন্ধানের মূল চরিত্রে দেখা গেছে উন্নাসিকতা, পশ্চিমা অহং ও শ্রেষ্ঠত্বের অহম। যা এক ধরণের অস্বীকৃতিকে উদযাপন করতে করতে মাঝে মধ্যে স্বীকার করে আমাদের এই জিনিশটা প্রাচ্যের এই জিনিশটার উত্তরসূরী! কিন্তু প্রাচ্যের বিদ্যাবত্তা যেখান থেকে যা পেয়েছে, তার প্রতি অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করেছে। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।

নিজেদের প্রাপ্ত জ্ঞানের পূর্ববর্তী সূত্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উদার ছিলো মুসলিম জ্ঞানকলা। এই উদারতা বলতে গেলে বিনয়ের সেই স্তরে চলে গিয়েছিলো, যার মধ্যে অবস্থান করে মহান আল বেরুনী বলেন আমরা কী আর জ্ঞান চর্চা করলাম। আসল কাজ তো করেছেন পূর্ববর্তী জাতিগুলো!তাদের থেকে জ্ঞান পেয়েছি আমরা। এই মানসিকতা ও স্বীকৃতির সুবিধা সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে ইউরোপ। বস্তুত মুসলিমরা গ্রিকদের জ্ঞান-দর্শন হাতে পেয়ে এর চর্চায় নিয়োজিত হয়ে যদি মহান গ্রিক দার্শনিকদের স্বীকৃতি না দিতেন, তাহলে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের নাম পরবর্তী পৃথিবীর মানুষ জানতো কী না মর্মে যে

[১] Centre for Islamic Thought & Studies, Jatrabari Email: 71.alhafij@gmail.com

সন্দেহ ব্যক্ত করেছিলাম প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগে, এখনো সেই সন্দেহ পোষণ করি সমান মাত্রায়।

প্রাচ্যের বিনয়ী ঐতিহ্য অনুসরন করে প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান পশ্চিমা বিদ্যায়তনের অস্বীকৃতিবাদী খাসলতের প্রতি সঙ্গতকারণেই দৃষ্টিদান করেন এবং কটুক্তি বা সমালোচনায় ব্যাপৃত হবার বদলে প্রতীচ্যের বর্তমান পণ্ডিতদের নিকট আহবান জানান, দেরিতে হলেও ওরিয়েন্টাল উইজডম এর ঐতিহাসিক ঋণ স্বীকার করুন।

এই ঋণের প্রশ্নে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্টাল ভাবধারা একটি অগ্রগণ্য দিক। এটি একান্তই ইসলামজাত বিজ্ঞান। বস্তুত আর কুরআন অবতীর্ণ হবার আগে পৃথিবীর কোথাও বিদ্যমান ছিলো না ব্যবহারিক বিজ্ঞানের তাজরিবী বা এক্সপেরিমেন্টাল ভাবধারা।যদিও আড়াই হাজার বছর আগের গ্রিসে প্রাকৃতিক দর্শন এর অনুশীলন ছিলো। যাকে কেউ কেউ ধরে নিতে পারেন অভিজ্ঞতাজাত বিজ্ঞানের জননী। কিন্তু উভয়ের বৈশিষ্ট একান্তই পৃথক, বৈশিষ্টগুলো চরিত্রগতভাবে যেমন আলাদা, পদ্ধতিগতভাবেও তাতে আছে দুস্তর অমিল।

গ্রিকদের প্রাকৃতিক দর্শন ছিলো চিন্তন সর্বস্ব।পর্যবেক্ষণের চেয়ে বরং ধারণাই ছিলো তার মূল উপাদান। যুক্তির একটা শৃঙ্খলার উপর তারা কায়েম করেন জ্ঞানকে। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফল তারা অনুসন্ধান করেননি। প্রাকৃতিক দর্শনকে তারা অনুসন্ধান করতেন তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার জবাবে। গ্রিক মন মূলত ছিলো দার্শনিক। সে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয়নি। ফলে সক্রেটিস নারীর দাঁতের সংখ্যা সম্পর্কে ভুল প্রচারণা চালিয়ে যান। যদিও তার ঘরেই ছিলেন এক/ দুই স্ত্রী। আসলেই কি নারীর দাঁতের সংখ্যা পুরুষের দাঁতের চেয়ে কম, সেটা চাইলেই তিনি যাচাই করে নিতে পারতেন। কিন্তু গ্রিক মন ব্যবহারিক যাচাই প্রক্রিয়ার অভিমুখী ছিলো না। যখন সমস্যা সামনে আসছে, সমাধানের জন্য চিন্তাকেই ধরা হচ্ছে অবিকল্প উপায়।

কখনো হয়তো প্রকৃতির সহায়তা নিচ্ছে গ্রিক মন। সেখানে উচ্চ কোনো জ্ঞান বা সত্য থাকতে পারে, এমনটি ভাবছে না। কারণ সেটা থাকে কেবল ভাবনায়, কেবল বুদ্ধিতে। ফলে যুক্তি প্রয়োগের বাইরে প্রমাণের আর কোনো প্রক্রিয়া তাদের সামনে প্রশস্ত নয়। অতএব গণিতের ক্লাসে এক ছাত্র প্লেটোকে যখন প্রশ্ন করছে, ব্যবহারিক জীবনে গণিতের উপযোগ কী? তখন প্লেটো বলছেন তুমি এটা ভাবতে পারো না যে, তোমাকে যা শেখানো হয়েছে, তার কোনো মূল্য নেই। তিনি তাকে একটি কয়েন ধরিয়ে দিলেন এবং ক্লাস থেকে বের করে দিলেন।

কিন্তু মুসলিম জ্ঞানকলা ব্যবহারিক মূল্যকে সবসময় অনুসন্ধান করেছে এবং বাস্তব যাচাই প্রক্রিয়াকে বিপুল গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ড. খান দেখান আল কুরআন থেকে কীভাবে জন্ম নিলো ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কীভাবে মুসলমানদের হাতে ৮০০ থেকে ১৭২০ অবধি বিকশিত ও চর্চিত হয় এই বিজ্ঞান, কীভাবে খ্রিস্ট্রিয় ত্রয়োদশ শতক থেকে প্রতীচ্যের পণ্ডিতরা তা রপ্ত করতে থাকেন ধীরে ধীরে। তারা শিখেন আরবী ও মুসলিম জ্ঞান। স্পেনিশ ও ল্যাতিন ভাষায় করেন এর অনুবাদ। ধীরে ধীরে যুক্তিবিদ্যা ছাড়া বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় কীভাবে তারা রপ্ত করেন ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং কীভাবে ঘটান এর প্রয়োগ।

মুঈনুদ্দীন আহমদ খানের প্রধান এক বই ; "Origin and Development of Experimental Science: Encounter with the Modern West। বাংলায় এটি প্রকাশিত হয়েছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান , উrপত্তি ও বিকাশ নামে । এপ্রিল ২০২১ এ এপিএল একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউস লিমিটেড (কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স , ২৫৩/২৫৪, এলিফেন্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা) প্রকাশ করেছে এর নতুন সংস্করণ। বইটিতে আছে দশটি অধ্যায় ও তিনট

প্রথম অধ্যায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত থেকেছে। এতে প্রথমত তিনি বিজ্ঞান ও মানবজীবনের পারস্পরিকতা, বিজ্ঞান কর্তৃক ধর্মের জায়গা দখলের সঙ্কট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন এবং এ নিয়ে দুনিয়াজোড়া চলমান প্রতিযোগিতার চিত্র হাজির করে আলোচনায় প্রবেশ করেন। এখানে তার অনুসিদ্ধান্ত : বিজ্ঞান বলতে আমরা ইংরেজি ভাষায় এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স এবং আরবী ভাষায় উলুম আত তাজরিবিয়া বুঝে থাকি। আর ইংরেজি ভাষার সায়েন্স একটি মৌলিক শব্দ হলেও বাংলা ভাষার বিজ্ঞানের মতো তা উলুমুত তাজরিবিয়ার অনুবাদ।

ড. খান দাবি করেন, আল উলূম বা বিজ্ঞান সমূহ এর ল্যাতিন অনুবাদে মধ্যযুগের প্রতীচ্যে ‘scientiis' কথাটি উদগত হয়, বারো শতকে। তার মতে, শব্দটি গঠিত হয়ে থাকবে ল্যাটিন ভাষার শব্দ মূল ‘sciens + entis' দ্বারা। তের শতকের শেষাংশে রজার ব্যাকন, দুই শব্দ বিশিষ্ট 'scientiae expirimentalis' পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করে আরবি 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া'র অনুবাদ রূপে প্রচলন করেন। এর ফলে প্রতীচ্যে ‘experimental scientiae'-এর ধারণার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু সম্ভবত মুসলিম ঐতিহ্যের প্রভাবের ভয়ে প্রতীচ্যের খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা ‘scientiae experimentalis' পরিশব্দটির

বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীরা এর পরিবর্তে গ্রিক ঐতিহ্যবাহী 'natural philosophy', তথা 'প্রাকৃতিক দর্শন' পরিশব্দ ব্যবহার করতে থাকে। অবশেষে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীতে তাঁরা অন্যভাবে উদ্‌গত ধর্মযাজকদের ব্যবহার মূলে প্রচলিত 'Science of God' পরিভাষার 'science' শব্দ গ্রহণ করে ' experimental science' নামে বিজ্ঞানের নামকরণ করেন।

উনিশ শতকের শেষাংশে 'experimental science'-এর বাংলা অনুবাদরূপে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' পরিভাষার উদ্ভব হয়ে বাংলা ভাষায় তা চালু হয়। সুতরাং ব্যবহারিক বিজ্ঞান যেমন 'Experimental Science' এর অনুবাদ, তেমনি 'Experimental science' তথা 'Scientia Experimentalis' আরবি 'আল-উলুম অত-তাজরিবিয়া'র ল্যাটিন অনুবাদ।

তাহলে উলুমুত তাজরিবিয়্যা কী, সেটার উপর আমাদের নজর বুলাতে হবে। উলুম হচ্ছে ইলম এর বহুবচন। এটি কুরআনী পরিভাষা, কুরআনের অভ্যুদয়ের আগে আরবিতে তা ছিলো ক্রিয়াবাচক শব্দ। ইলম বলতে বুঝানো হতো জানাকে। কুরআন সর্বপ্রথম একে জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করে এবং মহানবী সা. নতুন এই জ্ঞানীয় অর্থকে দেন স্থায়িত্ব। মুসলিম সভ্যতায় ইলম অচিরেই বিজ্ঞান এর অর্থবহ রূপ ধারণ করে।

তাজরিবা শব্দটি জন্ম নিয়েছে জারাবা -ইয়াজরিবু অথবা জাররাবা থেকে। যার মানে হলো ইমতিহান বা বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা, ইখতিবার বা সংবাদ যাচাই করে নেওয়া। একে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিণত করা হয় মুসলিম জ্ঞানকলার বাস্তববাদী নির্দেশনার কারণে। কারণ কোনো মানবীয় বা প্রাকৃতিক সংবাদ বা উপলব্ধিকে সত্য বলে মেনে নিতে হলে বাস্তব যাচাই, পরীক্ষামূলক প্রামাণ্যতার (তাবয়িন) নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রামাণ্যতার প্রক্রিয়া একটি ইলম। ফলে হযরত আলী রা. এর প্রজ্ঞা, জাফর সাদিক রহ. এর প্রেরণা ও জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২১-৮১৫) এর বিশ্লেষণে ইলম শব্দটি তাজরিবা (অভিজ্ঞতা) এর সাথে যুক্ত হয়ে বহু বচনে উলুম আত তাজরিবা হয়ে উঠে।

জাবির প্রচলিত ঐন্দ্রজালিক আলকেমিকে ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতা মূলক (তাজরিবা) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি প্রকৃষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত করেন। তিনি তাজরিবার তত্ত্ব নির্মাণ করেন এবং আলকেমিস্টদের উপদেশ দেন যে, যারা আলকেমিস্ট, তাদের জন্য সবচেয়ে জরুরী হলো প্রায়োগিক কাজে মগ্ন হওয়া

এবং তাজরিবা বা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাওয়া। বাস্তব কাজের ময়দানে প্রয়োগ না করলে আলকেমি থেকে কিছুই অর্জিত হয় না। যদি তুমি পূর্ণভাবে কিছু রপ্ত করতে চাও, তাহলে তাজরিবা চালিয়ে যাও। তিনি ঘোষণা করেন অংকের প্রয়োগ ছাড়া দর্শন বা বিজ্ঞান কোনোটাই সফল হতে পারে না। কারণ পৃথিবী নামক মহাগ্রন্থ গণিতের ভাষায় লেখা।

এই ভিত্তিমূলের উপর পরীক্ষামূলক জ্ঞানকে আরো শক্তিশালী ও প্রসারিত অবয়ব দান করেন আবু জাফর মুসা আল খারিজমী (৮০০-৮৪৭)। এলজেব্রার সূচনা ও বিশ্লেষাত্মক বিজ্ঞানাদির ভিত্তি গঠনে কাজ করে তার আল মুখতাসার ফিল হিসাব ওয়াল জাবরি ওয়াল মুকাবালা বা হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এলজেব্রা ও অংকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা । এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ বিজ্ঞানে এলো নবযুগ। খারিজমির সহকর্মী আবু ইউসুফ ইবনে ইসহাক আল কিন্দী (৮০০-৮৭০) অংক বিজ্ঞানকে ঔষধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মানবদেহে ঔষধের দ্বারা সৃষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি নিয়মিত পরিমাপ বের করতে সক্ষম হন। রোগের চরিত্র পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা ওয়েভার -ফেকনার ল নামে এ কালে প্রসিদ্ধ। আবু নসর আল ফারাবি (৮৭০-৯৫০) উদ্ভাবন করেন অংকের ক্ষেত্রে লাগারিদম এর হিসাব পদ্ধতি। তার ইহসাউল উলুম বা বিজ্ঞানাদির পরিগণনা বইটি তাজরিবাকে দেয় অধিকতরো প্রতিষ্ঠা। অতপর তাজরিবা ক্রমেই মুসলিম বিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি হয়ে উঠলো। ঐতিহাসিক আবুল ফরাজ জানান, সেকালের মুসলিম জ্ঞানসন্ধানীগণ নিজেদের অভিষ্ট লক্ষ্যার্জন থেকে অজানার পথে অগ্রসর হয়ে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির গোপন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করার প্রতি আত্মনিবেদিত ছিলেন। তাদের কেউই তাজরিবা বহির্ভূত কোনো জ্ঞানকে বিশ্বাস বা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইবনে সিনা এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞান সমূহের শ্রেণী বিভাজন করে তিনি লেখেন কিতাবু ফি আকসামি ইলমিল আকলিয়্যা। এতে অভিজ্ঞতাবাদী ও পরীক্ষামূলক জ্ঞানচর্চা এবং এর শাখা ও শর্তসমূহ সবিস্তারে আলোচিত। এক্সপেরিমেন্টাল পদ্ধতি এরপরে নানা মাত্রায় বিকশিত হয় , যার নজির দেখা যাবে ইবনে মিশকাওয়াহ (৯৩২-১০৩২) এর তাজারিবুল উমাম বা জাতিসমূহের জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতা নামক দুই খণ্ডের বিশ্বজনীন ইতিহাস গ্রন্থে।

ড. খান মুসলিম জ্ঞানীয় ঐতিহ্যের এই ইতিবৃত্ত হাজির করে এরপর দেখান কীভাবে এই বিজ্ঞান-ধারা ল্যাতিন অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপে স্থানান্তরীত হলো। গ্রিক ঐতিহ্যে যেহেতু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান চর্চা অনুপস্থিত ছিলো, গ্রিক পণ্ডিত-দার্শনিকগণ তুলনামূলক ধারণাভিত্তিক জ্ঞানের চর্চা করতেন, - ব্যবহারিক বিদ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না তাদের, ফলে ব্যবহারিক -পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের

সাথে তাদের সংযোগ ঘটে ইউরোপের বাইরের সূত্র থেকে। সেই সংযোগ ঘটান অনুবাদকগণ। ১১৩০ থেকে ১১৫০ অবধি স্পেনের এভাক রেমন্ড আরবী ভাষা থেকে ইবনে সিনার গ্রন্থাবলী অনুবাদ করতে থাকেন ক্যাস্টিলীয় ভাষায়। প্রতিষ্ঠা করেন অনুবাদ সেন্টার। তের শতকের মধ্যভাগ অবধি অনুবাদের এই ধারা চলমান থাকে। ক্যাস্টিলীয় স্প্যানিশে অনূদিত গ্রন্থাবলী পরবর্তিতে ল্যাতিনে রূপান্তরিত হয়। এই ধাপে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন জোহান্স হিসপানেলসিস। ডমিনিকান যাজক গোন্ডাসালভি , ক্রিমোনার যাজক জেরার্ডকে দেখা যায় একই সময়ে অনুবাদ করছেন মুসলিম গ্রন্থাদি। ১২১০ তেকে ১২২৫ এর মধ্যে এরিস্টটলের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ আরবী থেকে ল্যাতিনে অনূদিত হয়। মাইকেল স্কট ইবনে সিনার শুধু অনুবাদক ছিলেন না, তাকে অবলম্বন করে নবসৃষ্টিও করেন তিনি। রজার ব্যাকনের গ্রন্থাবলীও সর্বতোভাবে ইবনে সিনার নমুনায় রচিত। বিশপ ও অধ্যাপক রবার্ট গ্রসেটেস্ট ছিলেন ইবনে সিনার ভাবশিষ্য, অনুকারী ও আরব্যজ্ঞানের প্রচারক। এ্যালবাট দ্র গ্রেট, টমাস একুইনাস , আলেকজান্ডার হালিস, র‍্যামন মার্টিন, ব্ল্যাইস প্যাসকেলগণ মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে স্থানান্তর করতে সক্ষম হন। এরপর অভিজ্ঞতাবাদ ও পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান , যা প্রাকৃতিক জ্ঞানসমূহের মাতৃশক্তি, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি; সেই জ্ঞানধারা বিকাশের বৃহত্তর মাত্রা পেতে থাকে ইউরোপে, অপরদিকে মুসলিম দুনিয়ায় ক্রমেই বিজ্ঞানের পতন হতে থাকে।

এর পেছনে ড. খান চিত্রিত করেন কিছু কারণ। দৃশ্যমান কারণ ছিলো তাতারিদের ধ্বংসযজ্ঞ । আর আভ্যন্তরীণ কারণ হলো প্রায়োগিক বিদ্যা ও পরবর্তীতে ইউরোপের জ্ঞানীয় জাগরণকে পাত্তা না দেওয়া। এমনকি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ইবনে খালদুনও ইউরোপের নতুন জাগরণকে স্বীকার করেও এর গুরুত্বকে উপেক্ষা করেছেন। যদিও ব্যবহারিক বিদ্যাচর্চা মুসলিমদের মধ্যে একেবারে স্থিমিত হয়ে যায়নি। ফলে ১৩৫০ সালে তৈমুর বেগের নাতি উলুগ বেগের দরবারে মহাকাশ গবেষণা দেখা যায় , ১৭২০ সালেও দেখা যায় দিল্লীর শেষ মোঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের দরবারে যিজ মুহাম্মদ শাহী নামক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তালিকা সম্পাদনা করা হয়। ড. খান একে বলেছেন শেষ স্ফুলিঙ্গ। অপরদিকে পশ্চিমা দুনিয়ায় ষোড়শ শতক থেকে জ্বলছিলো নতুন স্ফুলিঙ্গ। সেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি একটা অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতা হয়ে উঠে এবং মুসলিম সভ্যতার লিগ্যাসি অস্বীকারের প্রবণতা পরবর্তীতে তীব্রভাবে লক্ষ্য করা যায়। উলুমুত তাজরিবিয়্যা এর ইসলামি স্প্রিটকে অস্বীকার করে গ্রিক দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির কাছে ইউরোপ খুঁজতে থাকে উত্তরাধিকার সূত্র। ফলে পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্ব ইসলামী জ্ঞানের সেই বিভূতি থেকে বঞ্চিত

হয়, যেখানে জানা ও বুঝাটাকেই জ্ঞানের শেষ কথা ধরা হয় না, বরং অন্তর দিয়ে অবলোকনের স্তরেও যেতে হয়।

ড. খান দেখান যেহেতু বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের প্রথম প্রবর্তন আল কুরআন থেকে, তাই কুরআনে রয়েছে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানপ্রকরণের সূত্র। সেটা হলো চার প্রস্তী জ্ঞাতত্ত্ব। অর্থাr কোনো বিষয়ের সত্য তালাশে চারটি প্রশ্নের সবিস্তার জবাব পেতে হবে। সেগুলো হচ্ছে (১) মাহিয়ত বা বিষয়টি আসলে কী? এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে পাওয়া যাবে তথ্যজ্ঞান। (২) ইদরাকিয়্যত বা কীসের কী, এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে পাওয়া যাবে তত্ত্বজ্ঞান, (৩) তাজরিবা বা বিচার ও যাচাই। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পাওয়া যাবে অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান (৪) তাদিল বা ন্যায়োচিত সত্যায়ন, এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পাওয়া যাবে সূত্রায়িত সিদ্ধান্ত।

আল কুরআন অজানাকে জানতে বলেছে তাজরিবী পদ্ধতিতে। এ পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো পর্যবেক্ষণ, দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো তথ্যগত মূল্যায়ন, তৃতীয় পদক্ষেপ হলো পরীক্ষা-নীরিক্ষা, চতুর্থ পদক্ষেপ হলো যথাযথ ন্যায়নিষ্ঠ তাদিল ও সমন্বিত জ্ঞান। কুরআনী জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে মুসলিম জ্ঞানের পুনর্গঠন সম্ভব এবং এটা সময়ের অবধারিত দাবিও বটে। ড. খানের গবেষণাকর্মটি এ পথে আমাদের জরুরী কিছু অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।